পরিবর্তন

অভিজিৎ মণ্ডল ও রামকৃষ্ণ বড়াল

গণেশ চন্দ্র সাহা, সাহা বাড়ির গৃহকর্তা। ঈশ্বরের নামে নাম হলেও ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা ওর একদমই নেই। বড়ই নাস্তিক মানুষ তিনি। বয়স প্রায় 55 ছুঁই ছুঁই। দুই পুত্র সন্তান ও দুই কন্যার পিতা তিনি। স্ত্রী মনিবালা ঠিক উল্টো পথের মানুষ। ঈশ্বর ভক্তি, পুজো-অর্চনা ইত্যাদি নিয়েই থাকতে ভালোবাসে।

কন্যাদের বিবাহ মোটামুটি ধুমধাম করে দিলেও পুত্রদের বিবাহ অনুষ্ঠান খুব অল্পতেই সেরেছেন তার কারণ, তিনি হলেন, প্রচণ্ড হাড় কৃপন মানুষ। আত্মীয় স্বজনদের সাথে বিশেষ যোগাযোগ রাখতে চান না — খরচের ভয়ে। তিনি থাকেন 2 তলা বাড়ির নিচের ডান দিকের ঘরে। এই ঘরে থাকার কারণও আছে বিস্তর। এই ঘরটা এমন পজিশনে যাতে করে ওর বাড়ির চৌহদ্দিতে কে ঢুকল, কে বেরোল, কে উপরে উঠল, কে নিচে নামল সবকিছুই লক্ষ্য করা যায় পরিষ্কার ভাবে। একটা-মশা-মাছিও তার চোখের আড়ালে প্রবেশ করতে পারবে না। প্রচুর চাষযোগ্য জমি, বাগান ও বেশ কয়েকটি বড় বড় পুকুরে মাছ চাষের দৌলতে তিনি এলাকাতে বেশ ধনী ব্যক্তি বলেই পরিচিত। এই সুবাদে পঞ্চায়েত সমিতিতে ও পাশের গ্রাম-গঞ্জে ওর বেশ নাম-ডাকই ছিল। একদিন ওর বড় মেয়ে ও জামাই হঠাৎ করে বাড়িতে এসে হাজির হল। বাবাকে প্রণাম করে ওরা ভিতরে গেল। মেয়ে-জামাই এসেছে ওই বাবুর-বাবুর তো মজা-মস্তি করবে ফিরে না ওই মনিবালা গেলেন গণেশবাবুর ঘরে অনুমতি আনতে। তিনি এক কথায় জানিয়ে দিলেন 500 gm চিকেনের

একটি মাছ পুকুর থেকে ধরতে, তার মণিবালা জানায় এই একটা মাছে কি হবে বাড়িতে এতো লোক-জন, তা-ছাড়া জামাইকে ২টো বড়ো পিস না দিলে হয়? তিনি জানান যা ধরার ওর মধ্যেই ধরতে হবে, হঠাৎ মণিবালা লক্ষ্য করে যে তিনি একটা খাতায় কি যেন লিখে চলেছে। নজরটা একটু এগিয়ে দেখে তিনি তো হতবাক! বললেন এ কি!

তাতে লেখা রয়েছে কোন মেয়ে-জামাই কবে এসেছে ও কবে গেছে, কতদিন ছিল, মেজ বৌমার বাপের বাড়ির লোকজন কতদিন ছিল, অতিরিক্ত কত খরচ হল ইত্যাদি।

মণিবালা রেগে বললে, "এসব কি হিসেব লিখে রাখছ নাকি?"

সনাতনবাবু জবাব দেন, - "না লিখে রাখলে উসুল হবে কি করে?"

"উসুল?" মণিবালা তো আকাশ থেকে পড়লেন।

সনাতনবাবু জবাব দেন - "হ্যাঁ উসুল" তিন যতদিন তার বাপের বাড়ির লোকজন এখানে ছিল, তিন ততদিন খেলে- তোমাদের ওদের বাড়িতে পাঠিয়ে রাখব তাহলেই সমান-সমান হয়ে যাবে।"

তিনি যে এরকম কড়া হিসেব রাখেন তা মণিবালা দেবী বিলক্ষণ জানেন। খেতের মজুররা এক কাপের জায়গায় ২ কাপ চা নিলে তিনি তার মজুরী থেকে পয়সা কেটে রাখতেন।

যাই হোক মণিবালা দেবী ৫০০ গ্রাম মাছের জায়গায় ১ কেজি মাছ কেনার অনুমতি অনেক চেষ্টা করেও আদায় করতে না-পেরে বিফল হয়ে রাগে গজগজ করতে করতে চলে গেলেন।

গণেশবাবু এবার তার চশমাটি খুলে বাক্সের উপর রাখলেন। তিনি তার টাকা-পয়সা সবই রাখতেন ঐ বাক্সের মধ্যে। বাক্সের তালার চাবি তিনি সর্বদা রাখতেন কোমরের ঘুনসির মধ্যে বেঁধে। স্নান, ঘুমানো, ওঠা-চলা সবসময় ঘুনসিতে ঝোলানো চাবির প্রতি তার লক্ষ্য থাকত সজাগ। তার সমস্ত সঞ্চিত অর্থাৎ টাকা পয়সা যে তিনি রাখতেন ঐ বাক্সের ভিতর তা কেউই জানত না। এমনকি মণিবালাও সে ব্যাপারে কিছুই জানত না। দিন-মাস-বছর অতিক্রান্ত হয়; ফুলে-ফেঁপে ওঠে গণেশবাবুর ঐশ্বর্য সম্পদ। মণিবালা দেবীর মনে শান্তি থাকে না। ঘর বাড়ির কলেবর বেড়ে যায় সময় এগিয়ে চলার সাথে সাথে। যে মানুষটার সাথে এতদিন ঘর-সংসার করলেন, তাকেও দেখছেন টাকা-কড়ির পেছনে আরো বেশি ছোটাছুটি করতে। তার বুঝতে অসুবিধা হয় না, গৃহকর্তা অবোধ গরীব মানুষগুলোকে ঠকাচ্ছেন। পাঁচ পুত্র পড়াশোনায় বেশিদূর এগোতে পারেনি। ছোট ছেলে রাজেন্দ্রসুন্দর নন-ম্যাট্রিক। পাড়ার বাউন্ডুলে ছেলেপুলের সাথে তার বেজায় সদ্ভাব। বড়ছেলে অনিন্দ্যসুন্দর পঞ্চায়েত অফিসে একটা কাজ জুটিয়ে নিয়েছে কোনক্রমে। বাড়িতে টাকাপয়সা দেয় না বলে গণেশ বাবু তাকে ত্যাজ্যপুত্র করেছেন। স্ত্রী ও পুত্র নিয়ে সে পাশের গ্রামে বীরেশ্বর বাবুর বাড়িতে ভাড়া থাকে। বাকী তিন পুত্র যোগেন্দ্রসুন্দর, মহেন্দ্রসুন্দর ও অনন্তসুন্দর সম্মিলিতভাবে সারের দোকান চালাই। গণেশবাবুর সাথে তাদেরও যোগাযোগ নেই। প্রবল ঝগড়াঝাটির পরে একই দিনে ওই তিনজনই বাবার ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে বাড়ি ছেড়েছিল। দুই বোন ত্রিপুরাসুন্দরী ও আনন্দসুন্দরীর ভরা সংসার। তারাও বাবার ব্যবহারে ক্ষুব্ধ। বাবার বাড়ি এলে তাদের স্বামী, সন্তানদের কিঞ্চিৎ যত্নআত্তি

হয় না। স্বামীরাও শ্বশুড়বাড়ির নাম শুনলে তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে। কাজেই দুইবোন বাপের বাড়ি আসাতে বিরাম দিয়েছে। গনেশবাবুও চান না দু'দিন অন্তর মেয়ে-জামাই তার বাড়িতে এসে একটা হৈ হট্টগোল বাঁধিয়ে রাখুক। ছোট ছেলে রামসুন্দরই তার একমাত্র পছন্দের সন্তান। তার কোন বায়না দাবীদাওয়া কিছুই নেই। কারোর সাথে মাঠে ঘাটে একটু খেলতে পেলেই হল। সে বিদ্যালয়ে যাওয়া বন্ধ করার সাথে সাথে গনেশবাবুর মনটা আনন্দে নেচে উঠেছিল, বইখাতা কেনা এবং টিউশনের খরচ বহন করার হাত থেকে নিষ্কৃতি পান। রাস্তা থেকে ফেরিওয়ালা ডেকে বাড়িতে জমে থাকা ভাঙরির সাথে কেজিদরে ছোট ছেলের বইখাতা গুলো বিক্রি করেছিলেন। মোক্ষম সময়ে তার বাড়িতে হাজির হয় কংসারি। তার হঠাৎ কিছু টাকার দরকার পড়ে। গনেশবাবু সুদে টাকা ধার দেন তবে খালিহাতে নয়। কংসারি তার পূর্বপুরুষের আমলের একটা হাতঘড়ি সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। সেটি হাতে নেবার সাথে সাথে গনেশবাবুর জহুরির চোখ বুঝে ফেলে ঘড়িটা মূল্যবান। কংসারির হাতে কিছু টাকা গুঁজে দেন। সে আরো কিছু টাকার জন্য অনুরোধ জানাই। গনেশবাবু সাফ জানিয়ে দেন তার কাছে আর টাকা নেই। কংসারি ফিরে যাই। সকাল সকাল বাড়ি থেকে সরস্বতী বিদেয় হয়েছে পরিবর্তে এসেছে লক্ষ্মী। তার উপরে কংসারির আগমন সোনায় সোহাগা। মা লক্ষ্মীর উপুর্যপরি উপস্থিতিকে সংসারে কালো মেঘের ছায়া দেখেন মনিবালা দেবী। চার ছেলে ও দুই মেয়ের জন্য তার বুকটা হু-হু করে। এমন সংসার তিনি কস্মিনকালেও চাননি যেখানে গৃহকর্তার ধনের প্রতি আসক্তি মানুষের জীবনের থেকেও বেশী। তার মন বিদ্রোহ ঘোষনা করতে চাই। পারিবারিক কৌলীন্য ও সামাজিকতা তাকে নিরস্ত্র করে। ছোট ছেলের ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে গেলেও আতঙ্কে আঁতকে ওঠেন। এসব কিছুর জন্য নিজেকে বড়ই অভাগা মনে হয় তাঁর। পারিবারিক কল্যান ও অগ্রগতির জন্য পূজার্চনা, ধর্মকর্ম নিষ্ঠা ভরে পালন করেন। তবুও সুখ, শান্তি যেন তাঁকে দেখে মুখ লুকাই। ইদানীং পথে ঘাটে চলতে চলতে মাথাটা কখনও কখনও চক্কর দিয়ে ওঠে। পাছে গনেশবাবুর ভর্ৎসনা শুনতে হয় সেই ভয়ে ডাক্তারখানা যাবার কথা মুখে আনেন না। বড্ড মনে পড়ে বরদাচরনের কথা। দুবেলা দুমুঠো ভাতের জন্য সে গৃহকর্তার সমস্ত ফরমায়েশ খেটে দিত। তার উপরে একটা মায়া পড়ে গেছিল

মনিবালা দেবীর। তিনি কিশোর বরদাচরনকে পুত্রসম স্নেহ করতেন। বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা, মাথায় মিশমিশে কালো কোঁকড়ানো চুল। ধীর, স্থির, রুচিমার্জিত ভাষা তার। মনিবালা দেবী মানসচোখে দেখতেন বরদাচরন একদিন সত্যিই বড় হবে এবং পিতা-মাতার মুখ উজ্জ্বল করবে। একদিনের ছোট্ট একটা ঘটনাই সে কোথায় যেন হারিয়ে গেল। এখন সে কোথায়, কোন অবস্থায় আছে তার বিন্দু-বিসর্গ জানেন না তিনি। আশায় বুক বেঁধে থাকেন, বরদাচরন একদিন ফিরে আসবে। সেদিন তিনি অন্তর থেকে স্বাগত জানাবেন। অপেক্ষার প্রহর গুনে আসছেন প্রায় দুই দশক ধরে। সেদিন বরদাচরন হাঁফাতে হাঁফাতে এসে বলেছিল, "মনিমা, বাবার শরীর খুব খারাপ ডাক্তারবাবু দেখে বলেছেন, মোটেই দেরি করা যাবে না। দ্রুত হাঁসপাতালে ভর্তি করতে হবে। তা না হলে বাবাকে আর বাঁচানো যাবে না। কিন্তু মনিমা চিকিৎসার জন্য অনেক টাকা খরচ। আমরা পাব কোথায়?" তার অশ্রুসজল চোখের দিকে তাকিয়ে মনিবালা দেবী বিচলিত হয়ে পড়লেন। হাতের চুড় দুটো তৎক্ষণাৎ খুলে বরদাচরনের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "এতে তোর বাবার চিকিৎসা হয়ে যাবে। আরও লাগলে জানাবি।" বরদাচরনের হাতে বেশিক্ষন দাঁড়ানোর সময় ছিল না। মনিবালা দেবীর দু পা ছুঁয়ে প্রনাম জানিয়ে সে প্রস্থান করে। ঠিক পরের দিন বাড়িতে তুলকালাম বেঁধে যায়। বাড়ির মধ্যেই বরদাচরনকে জুতোপেটা করেন গনেশবাবু। মনিবালা দেবীকেও আ-কথা, কুকথা শুনতে হয় বিস্তর। অসহ্য অপমানের বোঝা মাথায় নিয়ে বরদাচরন গনেশবাবুর বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়। ঝিকরগাছের মেলায় তার সাথে মনিবালা দেবীর প্রথম আলাপ হয়। কাঞ্চনকন্যা নদীর তটে এক বিশাল মন্দিরের অবস্থান। কালো পাথরের সুউচ্চ প্রাচীন স্থাপত্যটি নির্মান করেছিলেন রাজা গজেশ্বর রাও। রানি মৃন্ময়ী অতিশয় ধার্মিক মহিলা ছিলেন। একদা তিনি গভীর রাত্রে স্বপ্নে দেখেন উথালপাথাল কাঞ্চনকন্যা নদী থেকে এক রমনী উঠে আসছেন। কোটি চন্দ্রকেও হার মানাই তাঁর রূপ। টানা টানা ভ্রমর কালো চোখ। কোমর পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে গোছাভরা কালো চুল। পরনে তাঁর শ্বেতশুভ্র বসন। বামহাতে অমৃতকলস, ডানহাতে প্রস্ফুটিত রক্ত শতদল। তিনি মকর পিঠে অধিষ্ঠিতা। রানি বিস্ময়ে হতবাক। এমন সময় দেবীরূপী রমনী অতীব সুমিষ্ট কন্ঠে বললেন, "রানি

ময়নামতী, আমি স্রোতস্বিনী পুণ্যসলিলা কাঞ্চনকন্যা। এবার আমার নিত্যপূজার
বন্দোবস্ত করো, তোমার কল্যাণ হবে।" রানি ময়নামতী করজোড়ে বললেন,
"যথা আজ্ঞা মাতা।" উজ্জ্বল মণিখচিত স্বর্ণমুকুট পরিহিতা দেবী কাঞ্চনকন্যা
অভয়মুদ্রায় "তথাস্তু" বলে স্রোতের মধ্যে বিলীন হয়ে গেলেন। ঘুম ভাঙতেই
রানি দেখলেন মহারাজ তার পাশে গভীর নিদ্রা যাচ্ছেন। আসন্ন প্রভাতে
মহারাজকে সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। প্রজাপালক সুশাসক গঙ্গেশ্বর রাওয়ের
আর কিছু বুঝতে অসুবিধা রইল না। নদী তটে সুবিশাল কিকরগাছের মাঠে
কালোপাথর দিয়ে গগনচুম্বি এক ভব্য মন্দির নির্মাণ করে দেন মহারাজ।
সেখানে নিত্যপুজোর ব্যবস্থা করেন রানি ময়নামতী। স্বপ্নে তিনি দেবীর যে অবয়ব
দেখেছিলেন সেই রূপই গর্ভগৃহে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অর্থাৎ দেবী মকরবাহিনী
শ্বেতবসনা। বছরে একবার ধুমধাম করে দেবীর পুজো হয়। তখন বহু মানুষের
সমাগমে ভরে ওঠে নদীকূলের ওই বিশাল প্রাঙ্গণ। কয়েকদিন ধরে চলে মেলা।
রাজরাজাদের আমল থেকেই চলে আসছে এই পরম্পরা। তবে মেলার সময়সীমা
সঙ্কুচিত হয়েছে। দেবত্তর সম্পত্তি থেকে দেবী কাঞ্চনকন্যার নিত্যপূজা ও ভোগদানের
ব্যবস্থা হয়। এই মেলাতেই সপরিবারে দেবীদর্শন করতে এসেছিলেন গণেশবাবু।
জনজোয়ারে খোয়া যায় তার বড় ছেলে অনিন্দ্যসুন্দর। ভিড়ের মধ্যে খুঁজতে খুঁজতে
তারা ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়েন। বেলা গড়িয়ে আসে। একরাশ হতাশা যখন
তাদের ঘিরে ধরেছিল ঠিক সেসময় দেবদূতের মতো আবির্ভাব ঘটে সুদর্শন
ও সৌম্যকান্তি বরদাচরণের। অনেক খোঁজাখুঁজির পরে সে অনিন্দ্যসুন্দরকে
তার পিতামাতার কাছে ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হয়। মণিবালাদেবী মাথায় হাত
রেখে উপকারী বালকটিকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করেন। বরদাচরণের পিতা-মাতাকে
দেখার সাধ জাগে তাঁর মনে। মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে পায়ে হেঁটে বড়জোর আধঘণ্টার
পথ, একটি বিশাল অশ্বত্থগাছের নিচে বরদাসুন্দরের আবাসস্থল। একটি ছোট্ট কুঁড়ে
ঘরের মধ্যে পিতা-মাতা, বোনকে নিয়ে তার পরিবার। দুরন্ত দৈন্যদশা।
বরদাচরণের পিতা-মাতার সাথে কথা বলে মণিবালাদেবীর বড় মায়া হয়। গৃহকর্তার
অর্থ লিপ্সার ব্যাপারে তিনি অবগত, তাই বরদাচরণের বিশেষ সুবিধা করতে পারেননি।
দুবেলা ভাতের বিনিময়ে বাড়ির কাজ করে দিতে হবে। এর বেশি সুবিধা দিতে

নিমরাজি গনেশবাবু। বরদাচরনের অসহায় পিতা-মাতা তাতেই রাজী হন। গনেশবাবুর আমারবাড়ির একটা ঘরে তার থাকার ব্যবস্থা হয়। সকাল সকাল উঠে আমার বাড়ির কাজ সেরে সে গনেশবাবুর বসত বাড়িতে যেত। সেখানে সপ্তমাসের খাটার পর মিলত একবেলার খাবার। পড়াশোনায় সবিশেষ আগ্রহ ছিল তার। সারাদিনের কাজকর্ম শেষ হবার পর আমারবাড়ির ছুটঘরে কুপির আলো জ্বালিয়ে গভীর রাত পর্যন্ত পড়াশোনা করত সে। বিদ্যালয়ে সহপাঠীদের মধ্যে তার বড় নামডাক ছিল। বরাবরই ভালো ফল যেন তার অভ্যাসে পরিনত হয়েছিল। বিদ্যালয়ের গিরিজামোহন পন্ডিত প্রায়শই শ্রেনিকক্ষে বলতেন, "আমাদের বরদাচরন একদিন ভীষন বড় হবে, তার নাম দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়বে।" পারিবারিক অস্বচ্ছলতার কারনে বরদাচরনের স্বপ্ন ক্রমশ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছিল। গনেশবাবুর বাড়িতে কাজে লাগার পরে তার শিক্ষাসহনের পথে যবনিকাপতন ঘটে। তবুও নিজের দিক থেকে সে জ্ঞানার্জনের প্রয়াস জারি রেখেছিল তার কথা মনে পড়লে মনিবালা দেবী একান্ত নিভৃতে অশ্রু বিসর্জন করেন। বাড়ির অন্য কেউ এটা জানতে পারে না। তিনি রাধামাধবের আরাধনা করেন। গনেশবাবু এতে অবশ্য লাগাম পরাননি কারন তার শ্বশুরমশাই অমূল্যচরন বিদ্যাবাগীশ মনিবালাদেবীকে স্বামীগৃহে প্রেরনের সময় হাতে রাধামাধবকে তুলে দিয়েছিলেন। তবে সেকেই গনেশবাবুর বাড়িতে রাধামাধবের নিত্যসেবা, ভোগরাগ সহ সারা বছরের খরচ শ্বশুরালয়ের দেবত্তর সম্পত্তি থেকে আসে। কয়েকদিন পরে রাসসজ্জা। বাজার থেকে রাধামাধবের জন্য পোশাক পরিচ্ছদ কিনে এনেছেন গৃহকর্ত্রী। গৃহদেবতার সেবাকার্যের সময় বাড়িতে হুলুস্থুলু বেঁধে যায়। চাকরানির মুখে শুনতে পান, কোটালিপাড়ায় সুদের টাকা আদায় করতে গিয়ে গনেশবাবুকে বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়েছে। বাড়ি ফেরার সময় রাস্তার মধ্যে তার শরীর খারাপ হয়। বুকে হাত দিয়ে অস্ফুট স্বরে কিছু বলতে গিয়ে জ্ঞান হারান। এমন খবর শুনে মনিবালাদেবী আর ঠাকুরঘরে থাকতে পারেননি। হাতের কাছে টাকাপয়সা গয়না যা ছিল, নিয়ে এককাপড়ে বাড়ি থেকে বের হন। সোজা হাসপাতাল। ডাক্তারবাবু পরীক্ষা করে জানান রোগীর অবস্থা গুরুতর। তিনি ঝুঁকি না নিয়ে শহরের একটি নামী চিকিৎসা কেন্দ্র রেফার করলেন। অনেকটা সময় গড়িয়ে যাবার পরে মনিবালা দেবী সেখানে পৌঁছলেন। তার কবরীবন্ধন আলুথালু। চোখে মুখে ফুটে উঠেছে দীর্ঘ পথক্লান্তি জনিত বিষন্নতা। শুভ্র বসনে লেগেছে মলিনতার ছাপ। শহরের চিকিৎসা কেন্দ্রে এমার্জেন্সি বিভাগে দ্রুত ভর্তি করা গেল

Notes

গনেশ বাবুকে। প্রতীক্ষারত মেয়ে বসে চোখ দুটো লেগে এসেছিল মনিবালাদেবীর। ভোর রাতে শুনতে পারলেন গনেশবাবুকে অপারেশনের পরে বেডে দেওয়া হয়েছে। তিনি বিপদমুক্ত। কিছু ক্ষনের মধ্যেই জ্ঞান ফিরবে। খুব বড় মাপের অপারেশন হয়েছে। স্বামীর রোগমুক্তির কথা শুনে তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন। ঘুমে জড়িয়ে আসা দুটি চোখ আনন্দে চকচক করে ওঠে। আপনমনেই বলে ওঠেন, "হে রাধামাধব সব তোমারই খেলা, তাকে তুমি নবজীবন দিলে। এবার মানবিকতার বোধে দীপ্ত করো প্রভু।" এমনসময় একজন কর্মী এসে বললেন, "এই যে মা, আপনি আমার সাথে চলুন; বড় সাহেব ডেকেছেন আপনাকে।" মুখে কোন কথা না বলে ওই কর্মীর পিছু নিলেন মনিবালা দেবী। ঝাঁ-চকচকে মেঝের উপর দিয়ে হেঁটে চলেছেন, নিচে তাকালে যেন নিজের মুখটা মেঝেতে প্রতিফলিত হতে দেখা যাবে। একটা সুন্দর কারুকার্য করা দরজার সামনে নিয়ে এসে মনিবালাদেবীকে ছেড়ে দিলেন কর্মীটি, বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা কালো পোশাক পরিহিত সিকিউরিটি গার্ড সেলাম ঠুকে দরজা খুলে দিলেন। ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে মনিবালা দেবী যা দেখলেন তাতে ক্ষনিকের জন্য বাকরহিত হলেন। তাঁর দুচোখ থেকে বিগলিত অশ্রুধারা মেঝের উপরে ঝরে পড়ল, ততক্ষনে আরামকেদারা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন বড়বাবু। মুখে মলিন হাসি, চোখে আকস্মিক মিলনের আনন্দাশ্রু। অস্ফুট স্বরে 'মনিমা' বলে পদতলে ধপাস করে বসে পড়ে। মনিবালা দেবী তখন বড়সাহেবের মাথায় আলতো হাতের পরশ দিয়ে বলে ওঠেন, "আমার বরদাচরন। এতদিন কোথায় ছিলি বাবা? হয়ত পরম দয়াময় রাধামাধব পাপের প্রায়শ্চিত্ত করানোর জন্য তোর দরবারে আমাদের ভিখারির মত টেনে এনেছেন। আমাদের ক্ষমা করিস বাবা।" বরদাচরন তার মনিমার কোমল হাত দুটো ধরে নিজের চেয়ারে বসিয়ে দেয়। উভয়ের মধ্যে ক্ষনিক অভিমানের একপ্রস্থ খেলা হয়ে যায় যা সাধারন মানসলোকের পক্ষে বোঝা সত্যিই দুঃসাধ্য। মনস্তুষ্ট বরদাচরনের মুখে মনিবালা দেবী শোনেন একজন হত দরিদ্র থেকে বিত্তশালী হার্ট সার্জন হয়ে ওঠার নেপথ্য কাহিনি। আবার তাঁর দুচোখ সিক্ত হয়ে উঠল। দিনের আলো ক্রমশ জোরালো হচ্ছিল। প্রভাত সূর্য আকাশে ছড়িয়ে দিচ্ছিল তার লালিমা। এমন সময় মনিবালাদেবীও পৌঁছে যান গনেশবাবুর বেডের কাছে। মিটিমিটি চোখে চাওয়া গনেশবাবুও যেন তখন এক পরাজিত ও অসহায় সৈনিক। সহধর্মিনী মনিবালা দেবীর মুখেই শুনলেন বরদাচরনের বড় হওয়ার কাহিনি, এই বরদাচরনকেই একদিন জুতোপেটা করে বাড়ি থেকে দূর করে দিয়েছিলেন। অথচ সেই ছেলেটিই এত বছর পরে সুযোগ পেতেই অতীত আশ্রয়দাতার জীবন রক্ষা করার পাশাপাশি বহন করেছে চিকিৎসার সমস্ত ব্যয়ভার। গনেশবাবু যেন নিজের অদৃষ্টের কাছে খেলেন সপাট চড়। শয্যাশায়ী অবস্থায় ঘোষনা করলেন যে তার তিনশত বিঘা জমিতে শুধুমাত্র জনসেবার নিমিত্তেই গড়ে উঠবে হাসপাতাল। এই মহতী উদ্যোগের দায়িত্বভার অর্পন করলেন বিখ্যাত কার্ডিওলজিস্ট বরদাচরন মুখার্জীর হাতে।

<সমাপ্ত>